ঊনবিংশ অধ্যায়

ধর্মজীবন — বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব

১

সমুদ্র সৈকত। শ্রীক্ষেত্র। শীতকালের প্রভাত। স্বর্ণবর্ণ সূর্যদেব বারিধির গর্ভ হইতে উদিত হইতেছেন। সোনালী রং-এর মধুর ঝলক জলের উপর পড়িয়াছে। কি মনোহর দৃশ্য! বহু লোক সূর্যোদয় দর্শন করিতে আসিয়াছে। শীতকাল হইলেও পুরীতে প্রায় শীত নাই। সমুদ্রতটে বসন্তের মধুর ও শীতল সমীরণপ্রবাহ। অনেকে নগ্ন পদে সিক্ত বেলাভূমিতে বিচরণ করিতেছে 'ওজোন' লোভে।

বিনয়, মুকুন্দ ও জগবন্ধু ফ্ল্যাগস্টাফ হইতে উত্তর মুখে চলিতেছেন। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা। লাটভবন ছাড়াইয়া চলিয়াছেন পাথর কুঠীর সন্ধানে।

পাথর কুঠী সমুদ্রমুখী। পূর্ব বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। নিঃশব্দে তাঁহারা বারান্দায় উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া উত্তর দিকের ক্ষুদ্র গৃহটির অভ্যন্তরে দেখিতেছেন। তাঁহারা দর্শন করিলেন শ্রীমকে। বীরাসনে ধ্যানমগ্ন, মুখ সমুদ্রের দিকে। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। বাহ্য চেতনাহীন। মুখমণ্ডলে কি প্রশান্তি! যে দেখিতেছে, তাহার হৃদয়েও সংক্রামিত হইতেছে ঐ দিব্য প্রশান্তি। ভগবানকে কতখানি ভালবাসিলে এমন প্রশান্তি লাভ হয়!

একজন ভাবিতেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল স্পর্শে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ খাঁটি সোনা হইয়া গিয়াছেন — দুর্লভ বস্তু পরমাত্মা দর্শন করিয়াছেন। তবুও কেন অত ধ্যান? দ্বিসপ্ততিবর্ষ অতীত, তবুও কেন শ্রীম সর্বদা ধ্যান করেন? সংসারের কর্মপ্রবাহে তাঁহাদের মন থাকিতে চায় না। তাই কি এই স্বরূপ ধ্যান? শোকতাপক্লিষ্ট সংসার হইতে কি মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করাইতেছেন? সুষুপ্তিতে সকল জীবই ব্রহ্মানন্দে

নিত্য অবগাহন করে। কিন্তু জাগ্রত হইলে মনে থাকে না ঐ কথা।

শ্রীম চৈতন্য-পার্ষদ ছিলেন পূর্বাবতারে। এবারে ঐ চৈতন্যদেবই শ্রীরামকৃষ্ণ। এবারও শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ। তাই নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। ইঁহারা বুঝি স্বেচ্ছায় এক একবার ঐ পরমানন্দের সহিত মিলিত হইয়া নিম্ন মনের শোকতাপ ধুইয়া মুছিয়া আসেন। গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিলে শরীরের ময়লা দূর হয়, ইঁহারাও বুঝি মনের ময়লা দূর করিতে কখনও ব্রহ্মসাগরে ডুব দেন। ভক্তগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আর শ্রীম-র আননে প্রতিফলিত আনন্দে আনন্দিত হইয়া ধীর পদে পুনরায় সমুদ্রসৈকতে অবতরণ করিলেন। আনন্দ ও আক্ষেপ — দুই-ই ভক্তদের হৃদয়াভ্যন্তরে ওঠাপড়া করিতেছে। আক্ষেপ, কবে আমাদের দুর্লভ দিব্য অবস্থা লাভ হইবে?

ভক্তগণ সকলে নগরপরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন আশুবাবুর কুটীরে। ইহা স্টেশনের সন্নিকট। তারপর 'বড় দাণ্ডা' রাজপথে। এখানে পুটিয়ারানীর মন্দির দর্শন করিয়া নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর অনাথ আশ্রম ও আঠারনালা। পুনরায় নরেন্দ্র সরোবরের তীরে আসিলেন মিউনিসিপালিটির রাস্তায়। ভক্তগণ ক্ষুধার্ত। তাই তাঁহারা পুরীর উৎকৃষ্ট মর্তমান কদলী তিন আনায় এক ডজন ক্রয় করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার করিলেন।

এইবার লক্ষ্মীবাজারের পথ দিয়া ভক্তগণ জগন্নাথমন্দিরের উত্তর ফটকে উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দ মহারাজের শিষ্য সন্ন্যাসী দ্বিজেন বলিলেন, মন্দির এখন খোলা আছে। তাঁহারা নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। তাহার পর দর্শন করিলেন শয়নমন্দির হইতে। গর্ভমন্দিরের দর্শনের অবসর নয়টার পর। বিমলামন্দির লক্ষ্মীমন্দির প্রভৃতি সকল মন্দির দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দবাজারের ভিতর দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। মনোরঞ্জন ইতিপূর্বে মন্দিরে আসিয়া ভক্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

মুকুন্দ ইতিপূর্বে সমুদ্রতট হইতেই টি. রায়ের সঙ্গে শশী নিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ রামপুরহাট যাইবেন। ইনি ইউনিয়ান হাই স্কুলের রেক্টার। বিনয় মুকুন্দের জন্য কয়েক প্রকার মিষ্টি মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়াছেন। ভক্তগণ রাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুলাদি দর্শন করিয়া

শশী নিকেতনে ফিরিলেন সাড়ে এগারটায়। রন্ধন, সমুদ্রস্নান ও ভোজনাদি শেষ হইল অপরাহ্ণ দুইটায়। মুকুন্দ আজ যাইবেন। তাই ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে বাহির হইলেন পৌনে তিনটায়। তিনি মুচিসাঁই হইতে কয়েক জোড়া হরিণের চামড়ার জুতা খরিদ করিলেন। বিনয় আরও কয়েক জোড়ার বায়না দিলেন।

মন্দির এখনও খোলা হয় নাই। ভক্তগণ এই অবসরে বাসুদেব বাবাকে দর্শন করিয়া আসিলেন। মন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকট খাজাঞ্চিখানার পাশে বসিয়া ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন। একজন দিনপঞ্জী লিখিতেছেন। মন্দির খুলিয়াছে। সকলে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। আবার পরিক্রমায় বাহির হইলেন দক্ষিণ ফটক দিয়া। ভক্তগণ গোবর্ধন মঠে প্রবেশ করিয়া ভগবান শংকরাচার্যমন্দির ও গোবর্ধননাথ শিবমন্দির দর্শন করিলেন। এখন অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আজ সকালে সকলে সূর্যোদয় দর্শন করিয়াছেন। এখন সূর্যাস্ত দর্শন করিতে দ্রুতপদে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সূর্যোদয় যেমন মনোমুগ্ধকর, অস্তও তদ্রূপ মনোহারী। অত বড় প্রতাপশালী সূর্য দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল। উদয় ও অস্ত, জন্ম ও বিনাশ — বিধির এই নিয়মে আবদ্ধ সূর্যও।

ভক্তগণ সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে সমুদ্রের সুনীল জলরাশি, তাহার উত্তাল তরঙ্গ। সুবিস্তৃত আকাশ আর অস্তগামী সূর্য — এ সবই অনন্তের কল্পনার উদ্রেক করে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, যে অনন্তের সৃষ্টি এই অনন্ত বিশ্ব, যাঁহার কণিকামাত্র সূর্য, সমুদ্র ও আকাশ, সেই অনন্তই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন চৈতন্যশরীরে। আর তিনি দিব্য লীলা করিয়া গিয়াছেন এই পবিত্র ভূমিতে ভক্তসঙ্গে। সম্মুখে স্থাপিত এই হরিদাস-সমাধি, তাঁহারই হস্তে রচিত।

ঐ অনন্ত ব্রহ্মশক্তিই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তাঁহারই হাতেগড়া অন্তরঙ্গ পার্ষদ কথামৃতকার সুশীল সুপণ্ডিত আচার্য শ্রীম। এই মহর্ষিরই পুণ্য ছায়াতলে আমরা বাস করি এই পুণ্যতীর্থে। শ্রীম-র পুণ্যস্পর্শেই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত এই সকল উচ্চ পবিত্র ভাবরাশি। ভক্তগণের চর্মচক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা। কিন্তু মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ আত্মচিন্তায়। এক একবার মনের

কোণে ধ্বনিত হইতেছে আশার বাণী। ভাবিতেছেন, তবে আমরাও সকলে ধন্য। আমরাও পরম সৌভাগ্যশালী! তাহা না হইলে অবতারলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ হইল কি ভাবে? কেন আমাদের অত ভালবাসেন অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ? আবার একই সঙ্গে ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন, নিজ নিজ মনের নিম্নগামী বৃত্তির নির্মম খেলা দেখিয়া। আশা ও হতাশা, দুই-ই যুগপৎ মনকে আন্দোলিত করিতেছে। কিন্তু অবশেষে ভরসার ও সৌভাগ্যের রক্তিমাভায় মন সতেজ সরস ও সাবলীল হইতেছে।

ভক্তগণের এই সুখকল্পনা ভঙ্গ করিল আরতির শঙ্খ-ঘন্টানিনাদ। হরিদাস মঠে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ যুক্ত করে আরতি দর্শন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই-এর সম্মুখে সুচারুরূপে পঞ্চপ্রদীপাদি উপকরণে আরতি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব বাবাজীগণ ভক্তিভরে গাহিতেছেন — 'শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল' — এই সুমধুর আরতিসঙ্গীত।

ভক্তগণ এইবার বাহিরে আসিলেন। পথিমধ্যে এক দ্বাদশ বর্ষীয় বৈষ্ণব বালক আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। এই বালক কখনও কখনও শশী নিকেতনে যাইয়া শ্রীমকে সংকীর্তন শোনায়। খুব সুকণ্ঠ। ভক্তদিগকে সে তাহার আশ্রমে লইয়া গেল । মন্দিরের সম্মুখে করতাল বাজাইয়া কিশোর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল — 'ঐ গোরা রায়। গোরা মুখে রা রা বলে' ইত্যাদি।

এবার কবীর মঠ, বিদুর মঠ। বিদুর মঠের প্রধান ভোগ 'খুদ' — ভাঙ্গা চালের কণা। ভক্তদের হাতে ঐ 'খুদ' প্রসাদ দেওয়া হয়। দুর্যোধনের রাজভোগ ছাড়িয়া ভগবান কৃষ্ণ মহর্ষি বিদুরের কুটীরের গিয়া ভিক্ষালব্ধ 'খুদ' অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি খুদ অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য।

নানক মঠও এখানে আছে। সব মিলিয়া সাত শত মঠ ও আশ্রম পুরীতে। কথিত আছে, তীর্থভ্রমণে আসিয়া গুরু নানক সন্ধ্যারতি দর্শন করিতে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বারপাল মুসলমান ভাবিয়া তাঁহার পথ রুদ্ধ করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তখন বাহিরে বসিয়াই আরতি গাহিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত রচনা করিয়া। তিনি গাহিলেন — 'গগনময় থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে। তারকামণ্ডল চমকে

জ্যোতি রে।

কাশীর মত ধর্মাচার্যগণও জগন্নাথপুরীতে আসিতেন। এখানে ধর্মমত গৃহীত না হইলে তৎকালিক সমাজ ঐ ধর্মমত গ্রহণ করিত না। শংকর, রামানুজ, মধ্ব আদি সকল আচার্যই এই স্থানে আসিয়াছেন। আচার্যগণ এখানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠ ও রামানুজ আচার্যের বৈষ্ণব মঠ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, বর্তমান সত্রভোগের মন্দিরই প্রাচীন গোবর্ধন-মঠ।

ভক্তগণ স্বর্গদ্বার হইতে রাধাকান্ত মঠে আসিলেন। এই মঠের 'গম্ভীরা' নামক প্রকোষ্ঠে চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বাস করেন। শেষের অষ্টাদশ বৎসর এখানে একটানা বাস করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শেষ দ্বাদশ বর্ষ মহাভাবে অবস্থান করেন, দেশ-কালাতীত অবস্থায়। মঠের মহন্ত ভক্তগণকে চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কন্থা, খড়ম ও কমণ্ডলু জানালা দিয়া দীপকসহায়ে দর্শন করাইলেন। ভক্তগণ অবাক হইলেন, কি করিয়া অত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি অত দীর্ঘকাল ছিলেন! পা মেলিয়া একজন লোকের পক্ষে এখানে শয়ন সম্ভব নয়। আচার্যগণ লোকশিক্ষার জন্য অত কঠোরতা পালন করেন। সাধারণ লোক চায় অধিক আরাম। অবতারগণ চান, যতটা না হইলে নয় ততটা। শ্রীচৈতন্যের লৌকিক সম্পদ কটিবস্ত্র, জলপাত্র, খড়ম ও একখানা ক্ষুদ্র কন্থা — দিনান্তে একবারমাত্র মহাপ্রসাদভক্ষণ। কেন এই কঠোরতা? লোককে শিক্ষা দিতে — যত অল্পে দেহযাত্রা সম্পন্ন হয় ততটা লও। বেশী নিলে ঈশ্বরভজনে ব্যাঘাত হয়।

এই গম্ভীরার বাতাবরণ কি পবিত্র। পাঁচশত বৎসর অতীত, তথাপি মহাভাবের শান্তিময় প্রবাহ আজও এখানে বিরাজমান। মরমী অকিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়তন্ত্রীতে ঐ দৈবপ্রবাহ আজও অনুকূল প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে — কি শান্তি, কি আনন্দ, কি উন্মুক্ত দিব্য ভাব! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও এই মহাভাব সর্বদা উপভোগ করিতেন। বেদান্তের নির্বিকল্প অবস্থা, আর দ্বৈতবাদের মহাভাব একই পদার্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। জীবের ইহা হয় না। ইহার অধিকারী অবতারাদি। শ্রীমতী রাধারানীর উহা সর্বদা হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান একই জিনিস। দুই-ই মিলিত হয় একই স্থানে — পরম ব্রহ্মে, পরম সত্যে, সচ্চিদানন্দে। এই

গম্ভীরার প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও সকল ভক্তগণের চরণরেণুতে এই স্থান জীবন্ত।

ভক্তগণ শ্রীম-র আদেশে আজ সমস্ত দিনই নগর পরিক্রমা করিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমবোধ নাই, পরমানন্দে তাঁহারা মগ্ন। ইহাই বুঝি কৃপা। ভক্তের মনের চক্ষুতে কি এক অঞ্জন মাখাইয়া দেন মহাপুরুষগণ। তাহাতেই ভক্তদের আহার, নিদ্রা ও পরিশ্রমের বোধ হয় না। মন উৎসাহে আনন্দে সরস ও সজীব। প্রথমে ভক্তদের মন যাইতে চায় না এই বাহ্য রসহীন দর্শন ও পরিক্রমায়। কিন্তু, মহাপুরুষগণের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের আদিষ্ট সাধনপথে অগ্রসর হইলে, পরে বুঝিতে পারেন কত সরস সজীব প্রাণবন্ত, এই দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা-সাধন। হিমালয়ের গহনে বসিয়া যোগী যে আনন্দ উপভোগ করেন ঠিক সেই আনন্দ উপভোগ করেন ভক্তিযোগী অবতারাদির নরলীলাভূমিতে দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া। একটি স্থান প্রশান্ত গম্ভীর, অপরটি লীলাচাঞ্চল্যে আনন্দমুখর। উভয় যোগীই একই দিব্যানন্দ-উপভোগী।

২

জগন্নাথের সন্ধ্যারতি হইতেছে। গর্ভমন্দির অন্ধকারময়। কিন্তু এখন বেশ আলোকিত। এইক্ষণে একটি প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। ভক্তগণ গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। জগন্নাথের শ্রীমূর্তি যেন এখন সজীব ভাব ধারণ করিয়াছে। কত ভক্ত আর্তি নিবেদন করিতেছে কতভাবে। কেহ কাঁদিতেছে। কেহ প্রার্থনা করিতেছে — হে চকানয়ন, মোর ভাল কর। কেহ বলিতেছে, তুমি খবর কর। সংসারে আমার আর কেহ আপনার নাই। কেহ আনন্দে করতাল বাজাইতেছে, কেহ রামশিঙ্গা। কেহ বা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে। ইহকালসর্বস্ব বর্তমান যুগের লোকের দ্বারা এ আনন্দ উপভোগ অসম্ভব। এইসকল লোকও যদি কোন পুণ্যফলে একবার এই দৃশ্য দর্শন করে তবে তাহারও মন বিগলিত হইবে নিশ্চয়ই এই দিব্য আনন্দময় গম্ভীর ভাবপ্রবাহে। তাহার শুষ্ক বিচার এখানে সরল বিশ্বাসে পরিণত হইবে নিশ্চয়।

আরতি শেষ হইয়াছে। এখন গর্ভমন্দিরে পরিক্রমা। মিটমিট আলোর

সহিত গর্ভমন্দিরের অন্ধকারের লড়াই চলিতেছে। আর লড়াই চলিতেছে দর্শকদের — কে আগে দর্শন প্রণাম পরিক্রমা করিবে। তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ লড়াই করিতেছে স্বীয় প্রতিকুল ভাবনার সহিত। একজন ভক্ত ভাবিতেছেন — চৈতন্যদেব স্বয়ং এই জগন্নাথ মূর্তিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন আমিই জগন্নাথ। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথই মহাদেব, লক্ষ শালগ্রামের উপর বিরাজমান। আর তিনি তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে দিব্যচক্ষুর উন্মেষ হয়। তাহাতেই দর্শন হয় সত্যকার রূপ — যাঁহার প্রতীক এই মূর্তি। তাহার পূর্বে মহাপুরুষগণের কথাই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তখন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ধর্মসাধনে অগ্রসর হইতে হয়। অন্য পথ নাই। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বই ধর্মজীবনের চিহ্ন। পূর্ণ বিশ্বাস হয় ঈশ্বরদর্শনের পর। তৎপূর্বে এই দ্বন্দ্ব চলে। যেমন অন্ধের চালক চক্ষুষ্মান, তেমনি ধর্মসাধকের চালক দিব্যচক্ষুষ্মান আচার্যগণ, অবতারাদি। যেমন জড়বিজ্ঞান সাধকের অবলম্বন জড়বিজ্ঞান-বিশারদ আচার্য, তেমনি ধর্মবিজ্ঞান সাধকের অবলম্বন ধর্মবিজ্ঞান-বিশারদ অতীন্দ্রিয়দর্শী আচার্য। বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বন্দ্ব উভয় ক্ষেত্রে সমান।

ভক্তগণ রত্নবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। একজন ভক্ত তাঁহার দিনলিপি জগন্নাথের পাদস্পর্শ করাইলেন। ইহাতে আছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবর্ণন।

ভক্তগণ বাহিরে আসিয়াছেন শয়নমন্দিরের দক্ষিণ দরজাপথে। তাঁহারা সমগ্র অঙ্গন তিনবার পরিক্রমা করিলেন জগন্নাথ মন্দির ডান হাতে রাখিয়া। আর এই তিনবারই পার্শ্বদেবতাদের দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তাঁহারা দর্শন করিলেন — বিমলা গোপেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল, লক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীগণেশ ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, সত্যভামা নীলমাধব ও রাধাকান্ত লক্ষ্মী, সূর্যদেব বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি মন্দির। মহাপ্রসাদের মণ্ডি আনন্দবাজারও পরিক্রমা করিলেন আর দীনহীনভাবে ভূমি হইতে মহাপ্রসাদ কণিকা উঠাইয়া ভক্ষণ করিলেন।

অলৌকিক পরব্রহ্মের লৌকিকলীলা সম্পাদনই ভারতীয় দেব-মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। আর আত্মভাবে অর্চনাই দ্বৈতসাধনের হৃদয়কেন্দ্র। আজ লক্ষ্মীবার (বৃহস্পতিবার)। তাই দোলায় চড়িয়া লক্ষ্মীনারায়ণের

উৎসব-বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যেন বাসরশয্যা। আচার্যগণ শিক্ষা দেন, আত্মভাবে সাধন করিলে শীঘ্র চিত্তশুদ্ধি হয়। আর সেই শুদ্ধ চিত্তে নিজের স্বরূপ দেখে — 'অমৃতস্যপুত্রাঃ অথবা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি। ইহা হইয়া গেলেই কার্যসিদ্ধি। অপরোক্ষ দর্শন ভগবৎ কৃপাসাধ্য। 'যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য।' ঈশ্বর স্বতন্ত্র। সাধনলভ্য নন। যদি তাই হইত তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা বাধিত হয়। তিনি কোন বাহ্য দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত হইয়া পড়েন। তবে কিসে তিনি লভ্য - সাধনে? সেই সাধন সম্পন্ন করার পুরুষকারও যে তিনি, 'পৌরুষম্ নৃষু' — গীতার বাণী (৭-৮)।

তাহা অবশ্য সত্য। কিন্তু তিনি চান — যতক্ষণ মানুষের জাগতিক বিষয়ে পুরুষকার-শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা আছে তাবৎ সেই মানুষ ঈশ্বরীয় বিষয়েও সেই পুরুষকার-শক্তি প্রয়োগ করুক। এই দ্বন্দ্বই জগৎ। এইটি দিয়া ঈশ্বর জগৎলীলা করেন। এই দুইটি শক্তির সংঘাতই উন্নতি ও পতনের জীবন ও মরণের মূল। যেখানে এই শক্তিদ্বয়ের অবসান সেখানেই ঈশ্বর। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'এই অজ্ঞান কাঁটাকে জ্ঞান কাঁটা দিয়ে তুলে দুই ই পরিত্যাগ কর।' যতক্ষণ জ্ঞান, ততক্ষণ অজ্ঞান। এই দুটোই ছেড়ে তুমি বিজ্ঞানী হও।' তাই জগৎলীলা সংরক্ষণের জন্য পুরুষকার-শক্তির আবশ্যক। যতক্ষণ, 'আমি চোর' — এই বুদ্ধি, ততক্ষণই 'আমি সাধু' — এই বুদ্ধির প্রয়োজন।

তাই এই ধর্মপথেও পুরুষকার আবশ্যক। ইহা ভগবৎসৃষ্ট ও আচার্যোপদিষ্ট। তাই আচার্যগণ উপদেশ দেন আত্মভাবের অর্চনা। এজন্য ভক্তগণ নিজে যাহা ভালবাসে তাহাই ভগবানকে দিয়া করাইতে ভালবাসে। ইহা হইতেই লক্ষ্মীনারায়ণ হরপার্বতীর বিবাহাদি লীলার উদ্ভব। যদ্যপি ভগবান অনাদি অনন্ত, তথাপি জগৎলীলায় তিনি আদ্য সান্তাদি ভাব গ্রহণ করেন। ভক্তের হাতে পড়িয়া ভগবানকে জন্ম, কর্ম, বিবাহাদি করিতে হয়। এইসকল তাঁহার বিদ্যামায়ার খেলা। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য — ঈশ্বরলাভ বা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তিলাভের উপায় নিজের ভাবে তাঁহার পূজা। তাই লক্ষ্মীনারায়ণ আজ দোলায় চড়িয়া লক্ষ্মীমন্দিরে যাইতেছেন, যেমন পুরুষ যায় স্ত্রীর কাছে বাসরে।

আরতির পর অভিষেক। এবার হইবে জগন্নাথের নৈশ শৃঙ্গার। মূল্যবান বস্ত্রাদি, সুগন্ধ পুষ্প, টাটকা তুলসী, চন্দন ইত্যাদিতে মূর্তির অঙ্গ বিভূষিত।

ভক্তগণ এই শৃঙ্কার দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিবাসস্থল শশী নিকেতনে ফিরিলেন রাত্রি নয়টায়।

শশী নিকেতন। শ্রীম হলঘরে কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। ব্রহ্মচারী বিমল (পার্থ চৈতন্য) শ্রীম-র সম্মুখে বসা। শীতকাল। শ্রীম-র গায়ে ছাই রঙ্গের ওয়ার-ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। মাথায় কম্ফোর্টার। কাপড় পরিয়াছেন মুক্তকচ্ছ। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বিমলের প্রতি) — বড় কঠিন পথ! খুব সাবধানে চলতে হয়। ধর্মজীবন সকলের পক্ষে নয়। যারা বহু জন্ম তপস্যা করেছে তাদের হয় একটু। শুধু কতকগুলি বুলি আওড়ালেই হয় না। চার দিকে থেকে বিপদ। সব চাইতে বড় বিপদ লোকমান্য। এটি না ছাড়তে পারলে ধর্মের ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের কৃপায় হয়। আর নিজের খুব চেষ্টা থাকলে হয়। ঠাকুর তাই লঙ্কাফোড়ন দিয়ে বলতেন, 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে। সাধুদেরও ফেলে দেয় লোকমান্য — এখন অপরের 'কা কথা।'

ঠাকুর বলতেন, তাঁর শরণাগত হয়ে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দর্শন হয়। তাই তিনি প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'দেহসুখ চাই না, মা। লোকমান্য চাই না, মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না, মা। শতসিদ্ধি চাই না, মা। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর এই কর, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

এখন রাত্রি দুইটা। দুইটি ভক্ত দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসলেন। শ্রীম-র নিদ্রা অতি অল্প। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? একজন বলিলেন, মনোরঞ্জন। শ্রীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন - আর কে? মনোরঞ্জন উত্তর করিলেন, জগবন্ধু। কোথায় যাচ্ছেন, শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। মঙ্গল আরতি দর্শন করতে মন্দিরে যাচ্ছি, মনোরঞ্জন বলিলেন।

শীতকালে জগন্নাথের মঙ্গল আরতি হয় রাত্রি প্রায় দুইটায়, অতি প্রত্যুষে। কি সুন্দর সময়! প্রকৃতি শান্ত। মন তখন স্বভাবতই আনন্দে পূর্ণ থাকে। কতকগুলি ব্যাকুল ভক্ত নিত্য এই শুভসময়ে আসিয়া আরতি দর্শন করেন। ভীড় নাই। এ সময়ে সকলের মন্দিরে যাইবার অনুমতি থাকে না। দ্বাররক্ষক কি ভাবিয়া এই দুইজন ভক্তকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল।

শঙ্খ ঘন্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। পূজারী পঞ্চপ্রদীপ শ্রীবিগ্রহের

সম্মুখে দোলাইতেছে। বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা।

একটি ভক্ত আরতি দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন — বিশ্বাসের দৃষ্টিতে এই পাট ও শণময় মূর্তিই জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য দেখতেন এই মূর্তিতে সাক্ষাৎ ভগবান। শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন, মহাদেব। আর তিনি তাঁর চরণ পূজা করেছিলেন। কত বিশ্বাস চাই? কি করে হয় এই বিশ্বাস? দৈব সহায়তা ভিন্ন ইহা সম্ভব নয়। যখন শুষ্ক বিচার বিশ্বাসে রূপান্তর হয় তখন হয়, শ্রীম বলেন। ঠাকুর তাঁকে বলতেন, বালকের বিশ্বাস। মনের সকল সংসার-বাসনার যখন অবসান হয় তখনই মন হয় বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ মনে আসে বালকের বিশ্বাস। ঠাকুর আরও বলতেন, এই শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা — এক। মনের মনত্ব গেলে হয় ঐ অবস্থা। অনেক দূরের কথা। সেই সৌভাগ্য কি আমাদের ভাগ্যে ঘটবে।

মঙ্গল আরতির পরই অভিষেকস্নান। দেবঅঙ্গ হইতে সকল বস্ত্রাদি উন্মোচন করা হইল। স্নানের পর আবার বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করা হইল। শয়নমন্দিরে দাঁড়ইয়া ভক্তগণ সব দর্শন করিতেছেন। একজন পূজারী সকল ভক্তদের স্নানজল, চন্দন, তুলসী ও পিটিলি প্রসাদ দিল। এইবার বাল্যভোগ হইবে। এখন রাত্রি চারিটা।

ভক্তরা সব চলিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিবাসস্থলে শশী নিকেতনে। কিন্তু মন পড়িয়া আছে শ্রীমন্দিরে। কি আকর্ষণ! কত যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাস, ভক্তির ভাণ্ডার শ্রীমন্দির! সত্যই সংসার মরুভূমিতে এই সকল স্থানই মরূদ্যান। সংসারতপ্ত জীবগণ আসিয়া এখানে শান্তিলাভ করে। শ্রীভগবান কৃপা করিয়া ভক্তদের রক্ষার জন্য মহাতীর্থরূপে বিরাজমান। সংসারে বৈকুণ্ঠ এই মহাতীর্থ।

শ্রীম কাল ও আজের সব কথা শুনিলেন ভক্তদের পরিক্রমার। বলিলেন, এই করে প্রতিটি মিনিট তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া তবেই কার্য্যসিদ্ধি। তবেই শান্তিসুখ আনন্দ।

শশী নিকেতন, পুরী।
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৬ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

বিংশ অধ্যায়

এই সব দেবচিত্র মনের খোরাক

১

শ্রীজগন্নাথ ধাম। শশী নিকেতন। শীতকাল। সকাল ছয়টা। শ্রীম হলঘরে উপবিষ্ট কার্পেটের উপর, দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে বসা স্বামী সিদ্ধানন্দ। ভক্তগণও আশে পাশে বসিয়াছেন। সকলের দৃষ্টি বিনয়ের উপর। তিনি একখানা গোলাপী রংয়ের বোম্বাই চাদরে মাথা ও মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী সিদ্ধানন্দের প্রতি) — কি আশ্চর্য! ঠাকুরকে এক মিনিটের জন্যও মা ছাড়া দেখা গেল না। আহার বিহার শয়নে যেমন শিশুর মা-বই অবলম্বন নেই, তেমনি ঠাকুরের অবস্থা। নিদ্রায়ও দেখেছি — তাঁর নিদ্রা নামমাত্র, দশ পনর মিনিট — মাঝে মাঝে, 'মা-মা' বলে ডাকছেন। অমন ব্যাকুলতা দেখা যায় না।

সাধারণ মানুষ যেমন বিষয়ে মগ্ন, ঠাকুর তেমনি সচ্চিদানন্দে মগ্ন। আর এক extreme (প্রান্ত), দূরন্ত জড়বাদ সম্মুখে আসছে দেখতে পেয়ে উনি ধরেছেন তার উল্টো পথটি। Contrast (তুলনার প্রতিকুলতা) না থাকলে চৈতন্য হয় না। তাই ঐ অবস্থা। যাকে তিনি বলতেন, ঘটি ঘটি কান্না, তাই তিনি কেঁদেছিলেন ঈশ্বরের জন্য। তিনি ইচ্ছা করে করেছেন এসব? না, তা নয়। জগদম্বাই করিয়েছেন সব। মায়ের হাতে যন্ত্র।

বলতেন, এর ভিতর দু'টি আছে। একটি ঈশ্বর — যাকে তিনি 'মা' বলতেন। আর একটি ভক্ত — যিনি কাঁদতেন, যিনি মায়ের জন্য ব্যাকুল। লোকশিক্ষার জন্য জগদম্বাই এই অবস্থায় রেখেছেন। মানুষ তাঁকে পাগল বলবে না তো কি? এক বিন্দুও ঐশ্বর্য ছুঁতে পারলেন না — খালি মুখে, 'মা মা'! যদি কেউ তাঁর এ অবস্থাটি চিন্তা করে, এতেই তার কাজ ফতে

হয়ে যাবে। ঈশ্বর দর্শন হবে।

তাঁর এ অবস্থাটি চিন্তা করলে difference-টা (পার্থক্যটা) ধরা যায় আমরা কোথায় আছি। এ না বুঝতে পারলে কি করে হবে, চাইবে কি? হয়তো despair (হতাশা) আসবে যখন বোঝা যাবে। তবেই ব্যাকুল হয়ে কান্না আসবে। তখন শরণাগতি ঠিক ঠিক। এটি হয়ে গেলেই অরুণোদয় হলো। তারপর সূর্যোদয়। (সাধুর প্রতি) আপনাদের জন্য তিনি ঐশ্বর্য রেখে গেছেন। উপভোগ করুন। অত পরিশ্রম করে দুধ থেকে মাখন উঠিয়ে রেখে গেছেন। এখন কেবল খাওয়া।

শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন। স্বামী সিদ্ধানন্দও উঠিলেন। শ্রীম নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সাধুর সহিত দুই একটা কথা কহিতে কহিতে হলঘরে আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

স্বামী সিদ্ধানন্দ একটি ভক্তকে তাঁহার কুটীরে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভক্তটি সবিনয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন, আজ কলকাতা যাব। মনে করেছি, এখানেই প্রসাদ পাব। সাধু চলিয়া গেলেন। মনোরঞ্জন নিমন্ত্রণ রাখিলেন।

স্বর্গদ্বার। সমুদ্রতীর। একটি ভক্ত সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি প্রকাণ্ড তরঙ্গ, ঘরের সমান উঁচু। উঠছে নামছে অবিরাম। কি প্রচণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি। কোথায় তার কেন্দ্র! কোথা থেকে আসছে, কোথায় বিলীন হচ্ছে! ভক্তের মনে এই সকল চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাই দৃষ্টি বাহিরে থাকিলেও অভিনিবেশশূন্য তাহা।

ভক্ত হঠাৎ দেখিলেন বহু দূরে কাল দুইটি পিণ্ড সমুদ্রজলে ডুবিতেছে আবার ভাসিতেছে। অনেকক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন, মৎস্যজীবি নুলিয়া দুইজন দূর সমুদ্রে জাল ফেলিয়াছে। অতি বিস্ময়ে তিনি ভাবিতেছেন — কি সাহস এদের, ভয় নাই মধ্য সমুদ্রে ভাসছে, তবুও! তিন টুকরো কাঠ, দশ ফুট লম্বা। এটাই রশিতে বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওতেই বসেছে দু!জন, মাছ ধরছে। অন্যের কাছে এটাই ভয় ও বিস্ময়ের — তাদের নিকট অতি স্বাভাবিক। অভ্যাসে ভয় দূর হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়। ভক্ত ভাবিলেন, আজ সকালে শ্রীম বললেন — বালকের মত কাঁদলে ঈশ্বর দেখা দেন। এইরূপ কান্না ও দর্শন, দুই-ই অসম্ভব বলে তখন মনে

হয়েছিল। নুলিয়াদের দেখে মনে হচ্ছে, এ-ও সম্ভব হতে পারে অভ্যাসে। সংসারসমুদ্রে ভাসা, কিন্তু লক্ষ্য থাকবে মৎস্যে, ঈশ্বরে।

একদল হিন্দুস্থানী ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া স্নানের প্রয়াস করিতেছে। উচ্চ তরঙ্গের জল গড়াইয়া আসিতেছে, যাইতেছে। যাত্রীগণ সকলে কাকস্নানের মত ঐ জলের ছিটা মাথায় দিতেছে। তাহাদের ভয়, পাছে তরঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ফলে তাহাদের শিরোদেশ জলের পরিবর্তে বালুকারাশিতে আবৃত। পাণ্ডারা কাহাকে ধরিয়া জলে নামাইতেছে। সব ভয়ে জড়সড়। একটা দুষ্ট তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে চিৎপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। চারিদিকের সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছে যাত্রীটির দুর্দশা দেখিয়া। বেশ মজায় মশ্‌গুল সব। কেহ সঙ্গীর দুর্দশা দেখিয়া একেবারে তীরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা একেবারে নাছোড়বান্দা — ধর্মের নামে দোহাই দিয়া টানিয়া আনিয়া জলে নামাইতেছে। বলিতেছে — আস আস, ইয়ারে আস। ধর্ম করো সমুদ্রস্নান করে।

কোন যাত্রী যাহা হোক করিয়া কাকস্নান করিয়া ফেলিয়াছে। পাণ্ডা তাহার হাতে একটি শুষ্ক ঝুনা নারিকেল দিয়া বলিতেছে, দাও সমুদ্র-ভগবানকো দাও। সমুদ্রে নারিকেল ফেলামাত্র নিম্নগামী তরঙ্গ উহা টানিয়া লইয়া যাইতেছে, পুনরায় ছুঁড়িয়া তীরে ফেলিতেছে। পাণ্ডাপ্রবর আবার ঐ নারিকেলটি আর একজনের হাতে দিতেছে। এইরূপে একই নারিকেল ফলে দশ জনের পূজা হইল — এক পাঁঠার একুশ বলির মত। নব্য শিক্ষিত লোক হয়তো এই দৃশ্য দেখিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু, নিরক্ষর গ্রাম্য যাত্রীদের মনে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে এইরূপ স্নান ও পূজায় — আমি সমুদ্রস্নান করিয়াছি এবং নারিকেল দিয়া সমুদ্রভগবানের অর্চনা করিয়াছি — এই বিশ্বাসে। বিশ্বাসই যে ধর্মের প্রাণ! ভগবান তুষ্ট বিশ্বাসে, শুষ্ক প্রাণহীন বিচারে নয়।

স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী বাবুরা কেহ কেহ সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছে। কেহ একাকী, কেহ পরিবারবর্গের সঙ্গে। কোনও নবীন দম্পতি সাহেবদের মত 'মর্নিং ওয়াক' করিতেছে আর রঙ্গরস করিতেছে। কেহ নগ্ন পদে সিক্ত বালুকার উপর দিয়া বেড়াইতেছে। কেহ জলের সন্নিকটে জুতামোজা

পরিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু যেই একটু অমনোযোগী হইয়াছে অমনি একটা দুরন্ত তরঙ্গ আসিয়া তাহার জুতামোজা ভিজাইয়া দিতেছে, আর অপর সকলে এই মজা উপভোগ করিতেছে। কেহ আবার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

বালক বালিকাগণ আনন্দে নানা রঙের ঝিনুক কুড়াইতেছে। কোন বাঙ্গালী পরিবার নুলিয়াদের সাহায্যে সমুদ্রস্নান করিতেছে। দুইজন নুলিয়া এক একজনকে দুই হাতে ধরিয়া জলে নামাইতেছে — যেন বলির পাঁঠাকে হাড়কাঠে ঢুকাইতেছে।

অনেকে কিন্তু বেশ কৌশলে আরামে স্নান করিতেছে। যেই তরঙ্গ আসিতেছে অমনি লাফাইয়া উহার উপর পড়িতেছে। আবার নিচে আসিতেছে, যেন দোল খাইতেছে। তরঙ্গ যেই আসিল অমনি নিচু হইয়া ডুব দিল, আর তরঙ্গ উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইহাদের নিকট সমুদ্রস্নান বেশ সহজ ও আনন্দপ্রদ। জগন্নাথ পুরীর সমুদ্রস্নান বাস্তবিকই সহজানন্দময়।

শ্রীম বলেন, তীর্থের সমগ্র ছবিটি নিতে হয়। তবে হৃদয়ে ছাপ লাগে, আর উহা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে। মন স্বভাবতঃ নিম্নগামী। তাই তাকে এই নিম্নশ্রেণীর আনন্দে রসায়িত করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে অনন্তের ছাপ, ভগবানের স্মৃতি। কেবল অনন্ত ভাল লাগবে কেন? সমগ্র দৃষ্টির যে কোনও অঙ্গ স্মরণ হলে বাকীটাও সঙ্গে এসে যায়। তবেই কাজ হয়ে গেল। তাই সব দর্শন করতে হয়, সব রস গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীম বলেন — দেখ, এই জগন্নাথ ধামে চৈতন্যদেব নিমগ্ন ছিলেন ব্রহ্মরসে নিরবচ্ছিন্ন একটানা দ্বাদশ বৎসর। আবার সাধারণ মানব নিমগ্ন আদিরসে — বিষয়সুখে। এই দুইটি চিত্রই ভগবানের দুইটি রূপ — একটি বিদ্যার রূপ, অপরটি অবিদ্যার। প্রায় সকল মানুষই অবিদ্যারসে মগ্ন, কখন ফিন্‌কির মত একটু জ্ঞান হলো। এই বিদ্যারসটি যেন চাটনির মত সে গ্রহণ করে। জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসের ফলে সে যখন বিদ্যারসে নিমগ্ন হয়, ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হয়, তখন অবিদ্যারস, বিষয়ানন্দ হয় চাটনির মত। বিদ্যা ও অবিদ্যার ক্রীড়াভূমি এই সংসার। এর উপর ব্রহ্মরস। চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ নিমগ্ন ঐ রসে, ব্রহ্মানন্দে।

শ্রীম অতি প্রত্যুষে সমুদ্রতটে পাথর কুঠিতে গিয়াছেন একান্তে ধ্যান

করিতে। কখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করেন। কখনও একটি ক্ষুদ্র গীতা খুলিয়া মহাবাক্য ধ্যান করেন। তিনি বলেন, রূপ বাণী ও জীবন — এই তিন প্রকারই ধ্যান। অরূপের ধ্যানও বিচারের দৃষ্টিতে রূপকল্পনা। শ্রীম আজ এখনও ফিরেন নাই। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

আজ ভক্তগণ কেহ কেহ কলিকাতা যাইবেন। একটি ভক্ত বিনয়কে লইয়া গেলেন শেষ দর্শন করিতে। গর্ভমন্দিরের পরিক্রমা বন্ধ হইয়া গিয়াছে নয়টা বাজিয়া দশ মনিটে। ভক্তদের বড়ই দুঃখ হইল। তাঁহারা অগত্যা শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল নিজ হস্তে কিছু ভেট দেন মন্দিরভাণ্ডে। তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। এখন সত্রভোগের আয়োজন হইতেছে। ইহাই আকারে বৃহৎ ভোগ, যদিও ভোগ্য দ্রব্যের প্রকারভেদ ও গুণবিচারে রাজভোগই প্রধান।

২

শ্রীম বলিয়াছেন, মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রসমূহ দুর্লভ। কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, আর কত পুরাণশাস্ত্র মন্থন করিয়া উহাদিগকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। এইসকল চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করা উচিত আর লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। ইহাতে নিজের ধ্যানের কাজ হয়। আর যাহারা দূরদেশে থাকে তাহারাও এইসকল চিত্রের বিবরণের মাধ্যমে লাভবান হয়। তাই ভক্তগণ এখন এইসকল চিত্র দর্শন ও লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এ সবই নাটমন্দিরের অভ্যন্তরগাত্রে। অভ্যন্তরে বিস্তৃত ছাদ। তাহার চারিদিকে চারিটি বেশ লম্বমান বৃহৎ slopes (ঢালু ছাদ)। সমগ্র স্থানের চিত্রগুলি নানা রং-এ অঙ্কিত।

উত্তরের ঢালু ছাদে ঃ

পশ্চিম দিক হইতে — (১) গোষ্ঠ, (২) কৃষ্ণকোলে বসুদেবের যমুনা উত্তরণ (৩) বালকৃষ্ণ (৪) বকাসুর বধ।

ঢালুর নিম্নে (বর্ডারে) — প্রান্তে ঃ

(১) দত্তাত্রেয় (২) পৃথু ও গাভী (৩) সনকাদি ঋষিগণ (৪) সুযজ্ঞ

— একদিকে হর-পার্বতী, অপর দিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ (৫) কপিল (৬) বরাহ ও অসুর।

পূর্ব ঢালুতে ঃ

উত্তর দিক হইতে — (১) ননীচোরা কৃষ্ণ ও যশোদা (২) রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি (৩) কালীয়দমন (৪) অহল্যাউদ্ধার — বিশ্বামিত্রসঙ্গে রাম লক্ষ্মণের আগমনে।

ঢালুর নিম্ন প্রান্তে ঃ

(১) মীনাবতার ও অসুর (২) ব্যাস ও নারায়ণ (৩) বামন ও বলীর সভা (৪) রামের রাজসভা (৫) পরশুরাম ও অষ্টভূজা — পরমহংস ও ব্রহ্মা।

দক্ষিণ ঢালুতে ঃ

পূর্ব দিক হইতে — (১) রাম লক্ষ্মণ সীতা ও মায়ামৃগ (২) বটপত্রে কৃষ্ণ (৩) রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র — ছত্রধারী দশরথ (৪) বনবাসী রাম ও লক্ষ্মণ — সম্মুখে হনুমান।

ঢালুর নিম্নে, প্রান্তে অঙ্কিত ঃ

(১) হয়গ্রীব (২) গজকচ্ছপ মোক্ষণ — নারায়ণ লক্ষ্মী (৩) সমুদ্রমন্থন (৪) ধন্বন্তরী — ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ ঔষধ লইতেছেন (৫) নারায়ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণ-বলরাম, বামে ব্রহ্মা ও সহচর, ডাহিনে হরপার্বতী (৬) চতুর্ভুজ বলরাম।

পশ্চিম ঢালুতে ঃ

দক্ষিণ দিক হইতে — (১) প্রহ্লাদ-পর্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রে পতন — ভগবানের সমুদ্রজলে দাঁড়াইয়া অঙ্কে ধারণ (২) রাধাকৃষ্ণ-পাদপূজা (৩) রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র, জনকসভা, হরধনুভঙ্গ (৪) নারায়ণ ও যোগী, রাধার কৃষ্ণকালী পূজা।

ঢালুর নিম্নে, প্রান্তে ঃ

(১) বুদ্ধ (২) নৃসিংহ — দুই দিকে কয়াধু ও প্রহ্লাদ (৩) মহাবীর (৪) গরুড়, ঋষভ (৫) মন্বন্তর।

মধ্যছাদে বৃহৎ চিত্র ঃ

মধ্যস্থলে — পদ্ম — রাসলীলা

উত্তরে — গোষ্ঠবিহার

পূর্বে — রাধাকৃষ্ণ, গোপীগণ, বাদ্যযন্ত্র — বীণা ও মৃদঙ্গ

দক্ষিণে — দোললীলা, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণের হোলী।

পশ্চিমে — বৈকুণ্ঠ — লক্ষ্মী-জনার্দন সিংহাসনে, ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ দণ্ডায়মান, গরুড় সম্মুখে উপবিষ্ট।

এখন বেলা এগারটা। বিনয় ও মনোরঞ্জন শশী নিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। জগবন্ধু সত্রভোগ দর্শন করিতেছেন। রন্ধনশালা হইতে বাঁকে করিয়া অন্নব্যঞ্জনের হাঁড়ি আসিতে লাগিল। প্রকাণ্ড সত্রভোগমন্দির হাঁড়িতে পরিপূর্ণ হইল। পুরীতে সাতশত মঠ ও আশ্রম আছে। সকল আশ্রমেই এখান হইতে অন্ন যায়। আবার যাঁহারা ক্ষেত্রবাসী, তপস্যা করেন, তাঁহাদের অন্নও এই মহাপ্রসাদ। লোকের বাড়িতে একদিন উৎসব হইলেই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর এখানে নিত্য চলিতেছে এই ব্যাপার, বিরাট ব্যাপার। এইদিক দিয়া দেখিলেও মনে হয় এসব ঈশ্বরেচ্ছায় চলিতেছে।

সত্রভোগমন্দির, তাহার পর নাটমন্দির, তাহার পরে শয়নমন্দির, এবং তারও পরে গর্ভমন্দির — এটি সকলের পশ্চিমে। এখানে রত্নবেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বেদীর উপর বিরাজমান। সত্রভোগের মন্দিরে পূজারী কাঠের পিঁড়িতে বসিয়া ভোগ নিবেদন করিতেছে। জগন্নাথ এক হাজার গজ দূরে পশ্চিম প্রান্তে।

একটি ভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের দাঁড়াইবার স্থানে গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া একসঙ্গে জগন্নাথ ও বিরাটভোগ দর্শন করিতেছেন। জগন্নাথ পশ্চিম প্রান্তে আর সত্রভোগের মন্দির পূর্ব প্রান্তে। ভোগের পর আরতি, তারপর দেবতাদের বিশ্রাম।

একজন ভক্ত কয়েকবার সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তাঁহার মন চলিতেছে না পুরী ও মন্দির ছাড়িয়া যাইতে। কিন্তু আজ অবশ্যই তাঁহাকে ফিরিতে হইবে কলিকাতায়। জগন্নাথের নিকট বিদায় লইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলা সাড়ে এগারটা। ভক্ত স্বর্গদ্বারের দিকে চলিতেছেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্ত মঠে গম্ভীরার উদ্দেশ্যে

প্রণাম করিয়া বাহির হইতে শ্রীচৈতন্য-চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া স্বর্গদ্বারে গেলেন। এখানে সমুদ্রস্নান করিয়া তিনি শশী নিকেতনে ফিরিলেন বেলা বারটায়।

শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন ভক্তদের খাবার ঘরে। তাঁহার হাতে একটি এনামেলের গ্লাস। তাহাতে ডাবের জল পান করিবেন। বিনয় নারিকেল ভাঙ্গিয়া জল শ্রীমকে দিলেন, আর নারিকেল খাইলেন ভক্তগণ। শ্রীম আজ ভক্তদের রান্নাই আহার করিলেন।

শ্রীম আহারান্তে আসিয়া বসিয়াছেন হলঘরের নৈর্ঋত কোণে তক্তাপোষের উপর। একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ আসছেন আপনি? কোথায় কোথায় গিছলেন? স্বর্গদ্বারের ওদিকেও গিছলেন কি? ভক্ত বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। মন্দিরে সকল চিত্রাবলী দর্শন করলাম। তারপর সত্রভোগ তারপর অন্য সব মন্দির। তারপর রাধাকান্ত মঠ দর্শন করে স্বর্গদ্বারে যাই। সেখানে সমুদ্রস্নান করে এই ফিরলাম।

শ্রীম বলিলেন, বেশ হয়েছে। তন্ন তন্ন করে যে সব দেখলেন এটা কাজ হলো। মনে দীর্ঘকাল এর দাগ লেগে থাকবে। আর এর একটা কথা স্মরণ হলেই সমগ্র পুরীর সিন্‌টি চোখের সামনে এসে পড়বে। ঠাকুর আমাদের এই সব সঙ্কেত শিখিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, মন সর্বদাই খোরাক চায়। এই সব দেবচিত্র খোরাক, যারা ঈশ্বরের পথে যায় তাদের। অন্যদের অন্য রকম মনের আহার। মনটি এইরূপে দেব-রংএ রঙিয়ে ফেলতে পারলে অর্ধ জীবন্মুক্ত। এইসব উপায় কি আমরা জানতাম? ঠাকুর এসে শিখিয়ে গেছেন। এখন এসব পরম্পরায় চলবে। আবার চাপা পড়ে যাবে। আবার তিনি আসবেন। এইরূপে অনন্তকাল চলছে, এক দিকে সংসার, অন্য দিকে ঈশ্বর।

যান যান, খেয়ে নিন। বেলা হয়েছে। সাড়ে বারটা এখন। আজ আবার কলকাতা যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি করুন।

ভক্তগণ আহার করিতে বসিয়াছেন। শ্রীম ঘরে আসিয়া আহার দেখিতেছেন। সুখেন্দুকে বলিলেন, এত বেলায় আপনার খেতে নেই — রোগা লোক। বসে পড়ুন। সুখেন্দু বিনয় মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু আহারে বসিয়াছেন। শ্রীম বাহির হইয়া নিজ কক্ষে গেলেন। খানিক পর

আবার আসিলেন। হাতে একটা টিফিন কেরিয়ারের বাটি, তাহাতে রস। বলিলেন, নিন্ এই রস দিয়ে খান, সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে নিন্ চাটনির মত হবে। বেশ লাগে। লেবু কে কেটে দেবে? বলিয়া নিজেই লেবু কাটিতে লাগিলেন।

একটি ভক্ত আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন লেবু কাটিতে। শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, আপনি বসুন। আহার থেকে এই রকম করে ওঠা উচিত নয়। এ-ও পূজা কিনা, আহুতি দেওয়া কিনা! গীতায় আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। একেই বলে আহার। ভগবান জঠরে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে রয়েছেন। বলেছেন,

'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥' (গীতা ১৫-১৪)।

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, হাতে একটি বড় রসগজা। ভক্তগণ উহা ভাগ করিয়া খাইলেন। আহারান্তে বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য সমাপ্ত হইল বেলা দুইটায়।

শশী নিকেতন, জগন্নাথ পুরী।
১লা জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ, ১৭ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, কল্পতরু দিবস।

একবিংশ অধ্যায়

ডায়েরীপাঠ — মাখন তুলে ঘোলে থাক

১

শ্রীম একান্তে ধ্যান করিবার জন্য নিত্য সকাল ও বিকালে তিনি ঘন্টা করিয়া সমুদ্রতীরে পাথর-কুঠিতে যান। আজ বিকালে যান নাই। তিনি অন্তেবাসীকে বলিলেন — কই, আনুন না আপনার ডায়েরী। শোনান একটু। অন্তেবাসী ডায়েরী হাতে করিয়া শ্রীম-র কক্ষে প্রবেশ করিলেন! তিনি বলিলেন — কই, ওরা কই সব? একজন গিয়া বিনয় ও সুখেন্দুকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে আসিয়া হলঘরে কার্পেটের উপর বসিলেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি, মুচকি হাস্যে) — লক্ষ্মীদিদির কথাটা পড়ুন তো, সেই দিন যা বলেছিলেন আপনি।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, আমি ওসব কথা লিখি নি। তিনি বলেন, সজনে ডাঁটা উনি চিবিয়ে দিতেন, ঠাকুর তা খেতেন। তবে সেই দিন দুপুরে, বারান্দায় বসে আপনাকে যা বলেছিলাম, তার যা মন্তব্য হয়েছিল সে কথা লিখেছি।

শ্রীম (সহাস্যে) — কোথায় পেল ওরা ওসব কথা?

অন্তেবাসী — আর একটি কথা লক্ষ্মীদিদি বলেছিলেন, আপনি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে যান, আপনি নাকি মুখ বুজে বসে থাকতেন। তাই দেখে ঠাকুর বলেছিলেন — তুমি কে গো, মুখ বুজে বসে বসে লেখো?

শ্রীম (সহাস্যে) — না, দেখে কত আহ্লাদ করতেন ঠাকুর।

অন্তেবাসী — ওঁর কথায় অনেক contradictory statements (পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি) দেখে আমি ওসব কথা লিখি নি।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — আমরা ওসব কথা শুনি নি কখনও। আর

ঠাকুরের কাছে বসে কখনও লিখি নি। ঘরে এসে লিখতাম। তা কেউ জানতো না। কেবল ঠাকুর জানতেন। অনেক পরে ঠাকুরের শরীর গেলে ভক্তরা কেউ কেউ জানতেন।

শ্রীম — আচ্ছা, ঐ দিনের বিবরণ পড়ুন তো, ভুবনেশ্বরে যেদিন আমরা গিছলাম।

অন্তেবাসী বিগত ২৯শে ডিসেম্বরের বিবরণ পড়িতেছেন। শ্রীম শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে ষোলটি মন্তব্য হইয়াছে। পাঠ চলিতেছে।

অন্তেবাসী — (পুরী স্টেশনে একজন রামায়ত সাধু চেলাসহ গাড়ীতে উঠিয়াছেন) চেলার চালচলন হাস্যের উদ্রেক করে।

শ্রীম (উচ্চ হাস্যে) — চেলার কথা ভুলবো না। এমনি করে (সটান) বসে (হাস্য)।

অন্তেবাসী — (খুর্দায়) শ্রীম-র কক্ষে একজন নূতন লোক উঠিয়াছে ওড়িষ্যাবাসী। বয়স পঞ্চাশ। মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার লেখা, ইত্যাদি। তৎপর কথোপকথন।

শ্রীম (সহাস্যে) — Dramatic, dramatic! (নাটকের মত, ঠিক নাটকের মত হয়েছে বিবরণ!)

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — পরের স্টেশন খণ্ডগিরি। ভক্তদের ভিতর আলোচনা হইতেছে খণ্ডগিরি গাড়ীর কোন দিকে। মনোরঞ্জন বলিলেন, দক্ষিণে। একজন ওড়িয়া যাত্রী বলিলেন উত্তরে। ...ঐ উত্তর দিকে খণ্ডগিরির শুভ্র মন্দির।...

শ্রীম — মনোরঞ্জনের কথা ঠিক হলো না। মন কত গোল করিয়ে দেয়। বিশ্বাস করবার যো নেই।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — (ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে) ঠাকুরের ভোগ হইয়া গিয়াছে। উহা এখন ব্রহ্মানন্দগৃহে নিবেদন করা হইয়াছে। ভক্তরা ব্রহ্মানন্দ গৃহে ভোগদর্শন ও প্রণাম করিলেন, ইত্যাদি।

শ্রীম — কি দেখলেন ঘরে লিখলেন না?

অন্তেবাসী — ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যে বিছানায় শয়ন করতেন, সেই খাট, সেই বিছানা যেমনি ছিল তেমনি আছে, যদিও তিন বছর হয়ে গেল

তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। বিছানার ওপর তাঁর ফটো রয়েছে। তাতে নানা রকম ফুল। তিনি ফুল খুব ভালবাসতেন। আর ইজিচেয়ারেও তাঁর ছবি আছে। ঘরটি বড়, নানা ভাবে সাজান আছে। আর একটি পবিত্র বাতাবরণ রয়েছে ঘরে। মন শান্ত হয় ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরের মেঝেতে চুনের সুন্দর প্লাস্টার।

শ্রীম — এসব লিখতে হয়। এতে লোকের উপকার হয়। এই যা বললেন, ‘মন শান্ত হয় ঘরে প্রবেশ করলে’ — এটা অতি important (মূল্যবান) কথা। মহাপুরুষদের ঘরে তাঁদের চিন্তাধারা সঞ্জীবিত থাকে। কত চিন্তা, কত ভাব ওখানে হয়েছে। তার ছাপ থাকে। কত বড়লোক, ঠাকুরের মানসপুত্র কিনা! অন্য লোকের ঘরে যাও অন্যরকম ভাব হবে, এদিককার সব ভাব, হীন ভাব সাংসারিক ভাব। ঠাকুর বলতেন, শিয়ালের গর্তে যাও অন্য জানোয়ারের লেজ টেজ মিলবে। সিংহের গর্তে মিলবে গজমুক্তা। ‘লেজ টেজ’ মানে হীন ভাব, সাংসারিক ভোগবাসনা। আর ‘গজমুক্তা’ মানে ঈশ্বরীয় ভাব। এসব বিবরণ হবে graphic (জীবন্ত)। তাতে dramatic touch ও (নাটকীয় সজীবতাও) থাকবে। কিন্তু মূল চেষ্টা থাকবে যাতে পাঠকের মনে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, জীব ঈশ্বরের সন্তান — ঠাকুরের এসব ভাব উদ্রেক করতে পারলেই লেখার সার্থকতা।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — শ্রীম দক্ষিণাস্য লিঙ্গরাজ মন্দিরে চলিয়াছেন। তাঁহার ডান দিকে বিন্দু সরোবর। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দিরশীর্ষ ও মন্দিরগাত্র দর্শন করিতেছেন। ডান হাতে নিকেলের চশমা, এক একবার চক্ষুতে লাগাইতেছেন। ইত্যাদি।

শ্রীম (জিহ্বাদ্বারা প্রগাঢ় আনন্দসূচক ‘চো চো’ শব্দে) — একে একে সব মনে পড়ছে। সব ভুলে যাচ্ছিলাম। তাই এই সব graphic description (প্রাণবন্ত বিবরণ) স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করে। আবার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কাজ। যেমন তুলি দিয়ে পেন্টিং, তেমনি এসব বিবরণ কলমের পেন্টিং। আবার ভাস্করের পেন্টিং হাতুড়ী বাটালিতে, আবার ছুঁচ দিয়েও হয়। কাঠে হয়। ধাতুনির্মিত পাতে হয়, মাটিতে হয়। এ সবই আর্ট।

কিন্তু ঠাকুরের আর্ট ছিল দিব্য, অতুলনীয়। সমাধি, নৃত্য, ইঙ্গিত,

ইসারা, কথা ও কার্যে মানুষের হৃদয়পথে ঈশ্বরীয় ভাব প্রস্ফূটিত করে দিত। তাতে মনের গ্রন্থি খুলে যেতো, জন্মজন্মান্তরের মনের ময়লা নির্মূল হয়ে যেতো।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে শ্রীম যাইতেছেন। পথের বাম দিকে একটি সাধু আসনে বসিয়া আছেন। যাত্রীদের কপালে সাধু বিভূতির তিলক দেন। আর যাত্রীগণ দুই একটা পয়সা দেয়। শ্রীমকে সাধু ডাকিতেছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে কপালে বিভূতির তিলক লইলেন। ইত্যাদি।

শ্রীম — প্রথমটা শোয়া ছিলেন। পরে উঠে বসলেন।

অন্তেবাসী — আমি তাঁকে বসা দেখেছি।

শ্রীম নিমীলিত নয়নে পাঠ শুনিতেছেন, বদ্ধাঞ্জলি স্বীয় অঙ্কে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — লোকে বলে সাধুরা পয়সা নেয়। ঠাকুর তার জবাব দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র মিত্রকে। বলেছিলেন, আমি বলি, পয়সা না নিলে ওরা খাবে কি? পয়সার কথা হলেই বাবুরা নারাজ। এলাহাবাদ কুম্ভ থেকে ফিরে এসে রাজেন্দ্র মিত্র সব বলছিলেন। বলছিলেন, সাধু পয়সা চায়। বললাম, কাল দেব। আর চলে এলাম। শুনে ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে ঐ বলেছিলেন, পয়সা না দিলে ওরা খাবে কি? আর 'কাল দেব' বলে চলে আসায় পয়সা না দিয়ে — এ কথা শুনে তিরস্কার করেছিলেন।

২

সুখেন্দুর অভ্যাস আহারান্তে একটু নিদ্রা দেওয়া। তাঁহার শরীর ভাল নয়। শ্রীম তাঁহাকে বলিতেছেন, শুনুন এসব। কি হবে ঘুমিয়ে। মনোরঞ্জন স্বামী সিদ্ধানন্দের কুটীরে প্রসাদ পাইতে গিয়াছিলেন। এখন ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি) — ওদিকে সব হয়ে গেল? কে কে খেলো? বসুন, বসুন, শুনুন। আপনারা কি করলেন?

মনোরঞ্জন — আমরা পরিবেশন করেছিলাম।

শ্রীম — হাঁ, ওটি খুব চমৎকার কাজ করেছেন — সাধুসেবা। সিদ্ধানন্দের কেমন সদ্‌বুদ্ধি হয়েছে। সাধু ভক্তের সেবা করছে। এতেই ওর

হয়ে যাবে।

Having eyes we see not, having ears we hear not. একেই বলে চোখ থাকতে কানা, আর কান থাকতে কালা।

এই একটি জ্বল জ্বল করছে। আর একটি বাসুদেব বাবা। আর সবার মুখ বেজার। পুরীতে এই দুইটিই আছে।

মনোরঞ্জন (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনি না যাওয়ায় দুঃখ করতে লাগলেন।

শ্রীম — সাধুদের নিমন্ত্রণ খেতে হয়। আমরা বুড়ো মানুষ। বললেই প্রথমে না করি।

একজন ভক্ত — মেগে এনে বিলিয়ে খায় — বাঙ্গাল দেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) এরূপ একটা কথা আছে।

শ্রীম — কি কথা, বলুন না।

ভক্ত — মাগ্যা আন্যা বিলাইয়া খায়। হাতে হাতে স্বর্গ পায়॥

শ্রীম — বাঃ, বেশ কথা তো!

শ্রীম ভক্তের সঙ্গে কথা কয়টি তিনবার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিয়া লইলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আচ্ছা, পড়ুন আপনার ডায়েরী।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — শ্রীম সিংহদরজায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দশটি কলসীতে অভিষেকের জল লইয়া দশ জন সেবক মন্দিরে আসিতেছে। জলের উপর আচ্ছাদন বৃহৎ একটি ছত্র। শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গলধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত। ভগবানের জন্য যাহা করা হয় সেই কার্যই শুভ ও পবিত্র। লোক সেই কার্যকে পূজার অঙ্গ মনে করিয়া সম্মান করে। ইত্যাদি।

শ্রীম — হাঁ, এই একটি বেশ সিন্।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — দক্ষিণ দরজা দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দরজার পাশে একটি তালাবদ্ধ বাক্স আছে। লেখা আছে, প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া দিতে হইবে এই বাক্সে, মন্দিরের সংস্কারের জন্য। ইত্যাদি।

শ্রীম — এ সবাইকে দিতে হয় না। এইজন্য (খবরের) কাগজে

অনেক লেখা হতো। এখন তাই হয়তো উঠে গেছে। দু'পয়সায় কত বড় কাজ হচ্ছে! সংস্কারের অভাবে কত মন্দির নষ্ট হচ্ছে। আমার ধারণা ছিল নাটমন্দির খোলা। কিন্তু সব দেখলুম বন্ধ।

জগবন্ধু — আজ্ঞে, বন্ধ কেন হবে, খোলা। ওদিকে আপনি যান নাই। আপনার আসার পূর্বে আমরা যখন আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম এখানে, তখন দেখেছিলাম, নাটমন্দিরে বসে একটি ব্রাহ্মণ কি পড়ছে। আর চারদিকে বসে অনেকে শুনছে।

মনোরঞ্জন (শ্রীম-র প্রতি) — আপনারা ওদিকে যান নি। প্রথমেই শয়নমন্দিরে গিছলেন।

শ্রীম — পাণ্ডা তাহলে আমাদের নাটমন্দির দেখায় নি। খালি প্রদক্ষিণ করলে।

জগবন্ধু — ওটা শয়নমন্দির, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রথম দর্শন করলেন। নাটমন্দির থেকে শয়নমন্দিরে যাবার দরজাটি বন্ধ ছিল।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — (গাইড) ঘ্যান্‌র ঘ্যান্‌র করিয়া পিছনে চলিয়াছে...বলিল...বাবু, না কাঁদলে কি মা দুধ দেয়? তাই মায়ের কাছে কাঁদছি।

শ্রীম (সহাস্যে) — দেখলেন, কি একটা cordial (আন্তরিক) সম্পর্ক পাতিয়ে নিলে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — (ভুবনেশ্বর মঠে) শালপাতায় অন্ন প্রসাদ পরিবেশন করা হইয়াছে। আর চায়ের প্লেটে পায়েস। শ্রীম-র পাশে বসা স্বামী শংকরানন্দ আর মহন্ত নির্বাণানন্দ। শ্রীম প্রসাদ খাইতেছেন আর ফষ্টি নষ্টি করিতেছেন। পায়েসের প্লেটটা মুখের কাছে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার এটা তোলা যেমন মেয়েরা নথ তুলে দেখে তেমনি (সকলের বিলম্বিত উচ্চহাস্য)।

শ্রীম — আহা, কি পায়েস! তিন দিন হাতে তার গন্ধ ছিল।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — ফুসফাস করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে খুর্দা জংশনে। কালো ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। শ্রীম বালকের ন্যায় কৌতুহলে উভয় পার্শ্বের বন জঙ্গল, রাখাল ও গরুর পাল দেখিতেছেন। নয়নে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শ্রীম — কই পাঁঠার কথা লেখেন নি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না। অনেকে পছন্দ করে না 'বলি', তাই লিখি নি।

একটি পবিত্র স্থানে পাঁঠা বলি দিয়া উহার ছাল ছাড়ান হইতেছিল। শ্রীম উহা দেখিয়াছিলেন।

শ্রীম (ব্যঙ্গ হাস্যে) — ও না খেলে কি হয়? কেমন করে লোক থাকবে? ঠাকুর নিরঞ্জনকে বলেছিলেন, এখানেও শনি মঙ্গলবারে বলি হয় — তবে তো আসবে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — ভক্তগণ খুর্দায় রাজেনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ...তাঁহার পত্নী অসুস্থা থাকেন বার মাস। তাই বড়ই দুঃখী, বড়ই অশান্তি গৃহে।...

শ্রীম — তাইতো ঠাকুর বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। বলতেন, বিয়ে করো না, যারা এখনও বিয়ে কর নি। যারা বিয়ে করেছে তাদেরও বলতেন, দু'টি একটি সন্তান হয়ে গেল — ব্যস্ ভাই বোনের মত থাক। কিন্তু সকলকেই সাধুসঙ্গ সাধুসেবা করতে বলতেন। সাধুসঙ্গটি থাকলে যারা ঘরে আছে, তাদের দুঃখ অত বোধ হয় না। সাধুদের দেখতে পায় কিনা — তাঁরা স্বেচ্ছায় কত দুঃখ বরণ করেন ভগবানের জন্য। কেন? না, সাধুদের এই জ্ঞান হয়েছে, ঈশ্বরই আমাদের অনন্ত কালের আপনার। তাই এঁদের কোনও দুঃখ অত কাবু করতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, আগে ঈশ্বরে ভালবাসা লাভ করে সাধুসঙ্গ ও তপস্যাদ্বারা, পরে সংসার কর। মাখন তুলে ঘোলে থাকলেও মাখন ভেসে থাকে। 'মাখন' মানে, ঈশ্বরে ভালবাসা। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — এই জ্ঞান। তাইতো রাজেনবাবুকে বললাম, সাধুসঙ্গটি রাখবেন।

অন্তেবাসী — ভক্তরা খুর্দায় জলযোগ করেছিলেন, কলা আর মুড়ি দিয়ে। মর্তমান কলা একটা এক পয়সা।

শ্রীম — ও বাবা, এক পয়সা করে একটা মর্তমান কলা পেলে কে না খায়? মধ্যাহ্ন ভোজন তো তেমন কারো হয় নি। বেশ হয়েছে।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — রাজেন শ্রীমকে (খুর্দায়) গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।...একজন লোক বসা। বেশ অনেকটা সাধুর মত। তাহার

সম্মুখে একটি সেতার পড়িয়া আছে বেঞ্চের উপর।...শ্রীম সাধুর কাছে গিয়া বসিলেন। ...এক সময়ে পরিবারের আট নয় জন লোক পর পর মরিয়া যায় ...তাই সংসার অনিত্য বোধ হওয়ায় সাধু হইয়াছেন। ... (শ্রীম তাঁহাকে) গাহিতে অনুরোধ করিলেও গান গাহিলেন না।

শ্রীম — হাঁ, সাধুটি গাইলেনও না, বাজালেনও না।

অন্তেবাসী (পড়িতেছেন) — গাড়ী সাক্ষীগোপাল ছাড়িয়া মালতীপুর স্টেশনের দিকে চলিতেছে।... শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন, ক্রাইস্টের কথা। এখন খ্রীস্ট-জন্মোৎসব চলছে।... ক্রাইস্ট জানতেন, তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে।... (বলেছিলেন) সে এখানে আমার সহিত ভোজন করছে। কিন্তু তবুও কিছু বললেন না।...

হয়তো লোকশিক্ষার জন্য তাঁরই ইচ্ছাতে এ লীলা। লোভ কত বড় শত্রু এটি দেখাবার জন্য এই লীলা। ...জুডাস্ কি আর খারাপ লোক ছিলেন তা নয়।

শ্রীম — কি আশ্চর্য! জুডাস্ ইসকেরিয়ট এই কাজটি করবেন জেনেও তিনি তাঁকে সঙ্গে রাখলেন, একসঙ্গে খেলেন! কি উদার দোষশূন্য দৃষ্টি! একেই বলে সমদৃষ্টি। কি অমানুষিক সহনশীলতা!

ভক্তরা সহনশীল হতে চেষ্টা করবে এই ঘটনা দেখে। ঠাকুর তাই বলতেন, শ ষ স! সব সহ্য কর। নেহাই-এর মত সহনশীল হবে ভক্ত! কত আঘাত পড়ে নেহাইতে, কিন্তু উহা নির্বিকার। আঘাতে হয়তো ভেঙ্গেই গেল, তবু প্রতিবাদ নেই। ঈশ্বরের জন্য যে সব সহ্য করে, ঠাকুর বলতেন, 'সেই রয়। আর সব নাশ হয়।'

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। শ্রীম সুখেন্দুকে বলিলেন, যান এখন ঘুমোন গিয়ে। (অন্তেবাসীর প্রতি) — সব শুনতে পারলুম না। অন্য কোনও occasion-এ (সুযোগে) শুনতে হবে।

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — কেউ যদি এসব কথা শুনতে চায় তবে শোনান যায় কি ভক্তদের?

শ্রীম — হাঁ। Private circle-এ (একান্ত আপন লোকদের) শোনান যেতে পারে। এর মাঝে মাঝে ঠাকুরের কথা থাকলে বেশ হয়। ঠাকুরের parallel (সমান্তরাল) উক্তি ও আচরণ থাকলে এর মূল্যবৃদ্ধি হয়, সমৃদ্ধ

হয়। এ যুগে ধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা ঠাকুরের কথা।

শ্রীম বিশ্রাম করিতে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বালিয়াটির জমিদার ভক্ত হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী সপরিবারে আসিয়া বসিয়া আছেন। একটু পর ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্যও আসিলেন। তারপর আসিলেন আরও কয়েকজন ভক্ত। সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম হলঘরে আসিয়া ভক্তদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। আজ ঠাকুরের কল্পতরু দিবস।

একজন ভক্ত কলিকাতা যাইতেছেন। শ্রীমকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন, কেউ কেউ যাচ্ছে তো স্টেশনে? ভক্ত উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। বিনয় ও মনোরঞ্জন যাচ্ছেন। শ্রীম উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে, 'দুর্গা, দুর্গা শ্রীদুর্গা!' — এই রক্ষাকবচ, এই মহামন্ত্র।

ভক্ত বিদায় লইলেন। কিন্তু তাঁহার মন চলিতেছে না। মন পড়িয়া আছে এই আনন্দময় ধামে। জগন্নাথ, সমুদ্র, সাধু, ভক্ত আর শ্রীচৈতন্যস্মৃতিপূত নূতন তীর্থস্থান সমূহ। এই দিব্যধামে এই সকল দিব্য বস্তু মনকে টানিয়া রাখিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বেও এস্থান ছাড়িয়া যাইতে ভক্ত প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের টান আরও প্রবল। যে টানটিতে এই সকল তীর্থে আন্তরিক সুরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে সেইটি — সেইটি জীবন্ত ধর্ম, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'কথামৃত'-কার শ্রীম।

শশী নিকেতন, জগন্নাথ পুরী।
১লা জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীঃ, ১৭ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, কল্পতরু দিবস।

পরিশিষ্ট

বেদতুল্য মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পুণ্য লেখক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত
চিরস্মরণীয় কয়েকটি দিনের স্মৃতিকথা *

১

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

এই মহিমময় মন্ত্রে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে শত শত প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আরম্ভীকৃত আধ্যাত্মিক এক অপূর্ব নবযুগের আবির্ভাবের সূচনার অধিনায়কও স্বামী বিবেকানন্দ। আর তিনি যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' জগতের সর্বধর্মসমন্বয়সূচক এক বিশ্বমহাধর্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা সমস্ত বিশ্বে সুপরিচিত। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীয় মহাবাণী অতুলনীয় ছন্দে অননুকরণীয় ভাষায় জগতে প্রচারের মহামানবতার অধিকারী, সাধারণের সুপরিচিত শ্রীম অথবা মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। জগতের সুবিখ্যাত অধিকারীগণের মূল্যায়ণে শ্রীম-র রচিত মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' আধ্যাত্মিক সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বস্তুত আজ পর্যন্ত জগতে যে সকল আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই গ্রন্থ সকলের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মত জগতের আর কোনও গ্রন্থেই আজ পর্যন্ত অত সমুজ্জ্বলভাবে কোনও মহাপুরুষের অথবা প্রোফেটের অথবা কোনও অবতারের মহাবাণী এরূপ সহজ সরল ও জীবন্ত ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলী ও অনুগামীগণের সকলের

* ইহা শ্রীম এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক বিশিষ্ট সাধুর সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

নিকটেই এ কথা সুবিদিত যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন, ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার সময়ে তাঁহার অবতারলীলা প্রচারের জন্য তিনি একদল অতি বিশিষ্ট শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই এক-একটি কার্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু শ্রীম-র উপর সুবিন্যস্ত ছিল এই কথামৃতের মাধ্যমে তাঁহার মহাবাণী জগতে প্রচারের ভার। তাই ইহা কিছুই আশ্চর্য নয় যে এই মহাগ্রন্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী সংরক্ষণে সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই মহাগ্রন্থ সিদ্ধপুরুষ ও সাধকের নিকট সমভাবে সদা আদৃত সহচর। ইহাতে তাঁহারা কেবল শূন্যগর্ভ শব্দজালের সম্মুখীন তো হনই না, পরন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত সম্মুখীন হন। আর দেখিতে পান ভগবান স্বয়ং অমৃতসম মহাবাণী উদ্গীরণ করিতেছেন আর সকলকে নিজ নিজ অভীষ্ট আলোক ও চেতনার পথে পরিচালিত করিতেছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমুজ্জ্বল বার্তাবহ এই মহাপ্রচারকের সঙ্গে মিলিত হইয়া অবিস্মরণীয় এক সপ্তাহ কাল বাস করিবার এক অভাবনীয় সুযোগ আমার লাভ হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য — শ্রীম-র অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা। আর শ্রীম কি করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পদাশ্রয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন এই বিষয়ে ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য চরিত্রের সুসম্পর্কিত শ্রীম প্রদত্ত কতকগুলি দিব্য ঘটনার সাক্ষাৎ বিবরণ প্রদান করা।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দুইবার দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার যান ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় বার ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। তিনি দ্বিতীয়বার যখন যান তখন উটিতে তাঁহার পূত সান্নিধ্যে থাকিয়া ছয় মাস ধরিয়া তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তাঁহার প্রথম বারের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সময়ে তিনি আমাকে একবার কলিকাতা দর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ দিকে তদানীন্তন বাঙ্গালোরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজীর

অনুমতি লইয়া আমি বাঙ্গালোর ত্যাগ করি। কলিকাতার পথে আমি প্রথমে মাদ্রাজ মঠে যাই, তারপর ভুবনেশ্বর মঠে। ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তখন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে এক সময়ে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন, তুমি যখন এত নিকটে আসিয়া গিয়াছ তখন তোমার পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করা উচিত। হয়ত তোমার জীবনে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর নাও আসিতে পারে। জগন্নাথদেব ঠাকুরের অতি প্রিয়। ইহার আগে কখনও আমি পুরীতে আসি নাই। তাই দয়া করিয়া তিনি মিশনের একজন বাঙালি মহাত্মা স্বামী সিদ্ধানন্দজীর নিকট একখানা পরিচয়পত্র দিলেন আর লিখলেন, তিনি যেন আমাকে দর্শনাদিতে সহায়তা করেন। এই পরিচয়-পত্র লইয়া আমি পুরীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

গাড়ী পুরীতে কিছু দেরীতে পৌঁছিল। তাই পাছে জগন্নাথদর্শন না হয়, এই ভাবিয়া আমি স্টেশন হইতে সোজা মন্দিরে চলিয়া গেলাম। আমি সিংহদরজায় প্রবেশ করা মাত্র একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মন্দিরের বাহিরে আসিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বাংলায় সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমিও ভাঙ্গা বাংলায় উত্তর করিলাম, ভুবনেশ্বর মঠ থেকে। আমি বাংলা ভাল জানি না। ঐ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া বাংলা ভাষায় আমার এই সামান্য জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন — বেশ, বেশ। আসুন, এইবার ভগবান দর্শন করবেন। তিনি আর বাহির হইলেন না, একেবারে আমাকে লইয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, এই দর্শন করুন। ডান হাতে বলরাম, মাঝখানে সুভদ্রা আর বাম হাতে জগন্নাথ। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমিই পুরীর জগন্নাথ।' চৈতন্যদেব নিত্য এই জগন্নাথ দর্শন করে ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। গর্ভমন্দিরে সাধারণের প্রবেশ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণস্থিত অপরাপর দেবদেবীর মন্দিরে আমাকে লইয়া গিয়া দেবদর্শন করাইলেন এবং তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এইটি বিমলাদেবীর মন্দির, একান্ন দেবীপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। এই মন্দির লক্ষ্মীদেবীর। এখানে জগন্নাথের উৎসব-বিগ্রহ রূপার দোলায়

চড়িয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত হইতে আসেন। এইভাবে সকল পার্শ্বদেবতার মন্দির দর্শন করাইয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন।

এই অযাচিত দয়াবান পুরুষ নাতিদীর্ঘাকৃতি। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহার বয়স সত্তরের উপর। তাঁহার নাসিকা সুদীর্ঘ আর বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। তাঁহার শরীরের উর্ধ্বভাগ দৈর্ঘে নিম্নাঙ্গ হইতে অধিক। তাঁহার শুভ্র শ্বেত শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত। উহা তাঁহার উন্নত নাসিকা ও মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পরিধানে বাঙ্গালীর পোশাক। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের মূর্ত বিগ্রহ!

মন্দির হইতে তিনি আমাকে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তিনি তখন শশী নিকেতনে বাস করিতেছিলেন। গৃহটি ঠাকুরের অতি প্রিয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবলরাম বসুর। ভোজনের পর আমি বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্ন প্রায় দুইটার সময় তিনি আমার ঘরে আসিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন আর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে যাবেন কি? আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এই সদাশয় ব্যক্তির সৎসঙ্গে সময় অতিবাহিত করা তো ভাগ্যের বিষয়!

আমরা সমুদ্রসৈকতে দুই ঘন্টা অতিবাহিত করিলাম। ঐ দুই ঘন্টা তিনি অনর্গল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এই লীলা কথঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণকীর্তন করিতেছিলেন, তখন এক অতি আশ্চর্য দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত আর দুই নয়নকোণ হইতে নির্ঝরের মত অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। পরে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, আমি যখন আপনাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করছিলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করছিলাম দীর্ঘকাল পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে সভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত দেবদৃশ্যাবলী। কালের ব্যবধান ভেদ করে ঐ দিব্যলীলা আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত — সাক্ষাৎ ও জীবন্ত। তাতেই আমি বিহ্বল হয়ে যাই। আবেগ সামলাতে না পেরে শ্রীভগবানের অমানবীয় করুণা আর

এই দিব্যদর্শনের জন্য আমার মনপ্রাণ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে।

এই বৃদ্ধ সজ্জনের অঙ্গে ও বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত এই অতিবিরল ও আশ্চর্যজনক দেবদৃশ্য দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে কখনও আমার হয় নাই।

এরপর আমরা পুনরায় জগন্নাথ মন্দিরে যাই। ইনি আমাকে সমস্ত দেবদেবীর মন্দির পুনরায় ধীরে ধীরে দর্শন করাইলেন। অপরাহ্ণের এই দর্শন আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিল। সকালের দর্শনে তাহা হয় নাই। কারণ, তখন সময় ছিল খুব অল্প। ইহার পরই আমাকে লইয়া আনন্দবাজারে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে জগন্নাথের ছাপ্পান্ন প্রকারের মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। ভক্তগণ এই মহাপ্রসাদ দেশদেশান্তরে লইয়া যান।

অতঃপর আরও কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান দর্শন করার পর আমরা আমাদের নিবাসস্থলে ফিরিয়া গেলাম। তখন সন্ধ্যার কিছু বাকি আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রাত্রে কি আহার করেন? আমি বলিলাম, আমি রুটি পছন্দ করি। আমার জন্য রুটির ব্যবস্থা হইল। আর সেবকদের দ্বারা বাজার হইতে রাজভোগ আনাইলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়াই আমি বিশ্রাম করিতে গেলাম। দেখিলাম তিনি ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় বলেন না।

২

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমার পূর্বেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন দেখিলাম। আমিও শীঘ্র হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। সাতটা পর্যন্ত শ্রীম যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তারপর আমি জলযোগ করি। উনি সকালে কিছুই খান না। আমরা পুনরায় মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মন্দিরের বাহিরে পরিক্রমার সময় তিনি বলিলেন, গয়াধামে ভগবান জগন্নাথ তাঁর পিতাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমি তোমার পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্ম নেব। তারপর কথামৃতে বর্ণিত ঠাকুরের কতকগুলি লীলাকথা বলিতে বলিতে তিনি বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই বৃদ্ধ মহাপুরুষের আচরণ দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কে এই

প্রেমময় মহর্ষি? সাহসে ভর করিয়া সমুদ্রস্নানে যাইবার পূর্বে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি দীনভাবে উত্তর করিলেন, আমার নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। লোকে সস্নেহে 'মাস্টার মশায়' বলে ডাকেন। এই কথা শুনিয়া যুগপৎ আমার মনে বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক হইল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাহলে কথামৃতের লেখক শ্রীম? তিনি সবিনয়ে উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। একথা শুনিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমি বিস্ময়ানন্দে একেবারে ডুবিয়া গেলাম আর বিহ্বল হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অতি আদরণীয় ও অতি প্রিয় পার্ষদের শ্রীচরণধূলি লইতে অগ্রসর হইলাম। বয়সে বহু কনিষ্ঠ হইলেও আমি সাধু বলিয়া তিনি তাঁহার চরণধূলি লইতে দিলেন না।

একটি বিষয়ে এখানে ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেটি এই — তাঁহার সঙ্গে বাসের সময় আমি অতি সজাগভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি নিজের সম্বন্ধে বা অপরের সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কখন একটি কথাও বলেন নাই। অবিরাম তাঁহার বদন হইতে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত নির্ঝরের মত নির্গত হইত। তাঁহার এই অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণকীর্তনের সব কথা কথামৃতে নাই বলিয়াই মনে হইত। অপ্রচারিত অনেক নূতন কথা শুনিয়াছি। আমার মনে হইত, তাঁহার এ কথামৃতবর্ষণ যেন জীবন্ত — হৃদয় মনকে জোর করিয়া অতি উচ্চে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে লইয়া যাইত। কাহারও লিখিত কোন প্রবন্ধ পুস্তক হইতে পড়া আর লেখকের নিজ মুখ হইতে তাহা শোনা যেরূপ ভিন্ন — 'কথামৃত' পড়া আর শ্রীম-র মুখে 'কথামৃত'-বর্ষণও সেইরূপ ভিন্ন। শ্রীম-র কথামৃত বর্ণনা মনোমুগ্ধকর জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। স্থান কাল পাত্রসমন্বিত এই মধুর বর্ণনা আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার ছবি জীবন্ত উপস্থাপিত করিত। ঐ লীলারসে কেবল তিনিই নিমজ্জিত হইতেন না, শ্রোতারূপে আমাকেও নিমগ্ন করিতেন। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে শ্রীম যখন তাঁহার প্রকোষ্ঠে একাকী থাকিতেন, তখন তিনি পদচারণ করিতে করিতে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত রামপ্রসাদের গান গুনগুন করিয়া গাহিতেন।

আমাদের মধ্যাহ্নভোজন বারটার মধ্যে শেষ হইত। তারপর আমরা বিশ্রাম করিতাম। বিশ্রামের পর তিনি আড়াইটার সময় আমাকে জাগ্রত

করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই আমরা সমুদ্রসৈকতে যাইতাম। দ্বিতীয় দিনে সমুদ্রসৈকতে বসিয়া শ্রীম ভগবান শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, ঠাকুর বলেছিলেন, গৌরাঙ্গ আর আমি এক। পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ চব্বিশ বছর বাস করেন । ইহার ভিতর চার বছর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাঁহার জীবনের শেষের বার বৎসর স্থানকালাতীত মহাভাবে অতিবাহিত করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার ভাবে নিমগ্ন থাকিতেন। একদিন ঐ ভাবাবস্থায় সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন টোটা গোপীনাথে ভাগবতপাঠ শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মহাভাবে নিমগ্ন হন। সমুদ্র অতি নিকটে। সমুদ্রের নীল জল দেখিয়া যমুনার নীল জলের কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। আর ঐ মহাভাবে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। ঐ অবস্থায় ধীবরের জালে আবদ্ধ হন। ধীবর মনে করিল একটি বৃহৎ মৎস্য আজ জালে পড়িয়াছে। কিন্তু জাল তীরে টানিয়া তুলিয়া দেখিল, সেটি মৎস্য নয়, একটি মানুষ। ধীবর ঐ জলমগ্ন মানুষটিকে জালমুক্ত করিতে গিয়া তাঁহার শরীরে হস্তস্থাপন করামাত্র সেই ধীবরও ভাবে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন চিত্তে চৈতন্যদেবকে খুঁজিতেছিলেন। ঐ হরিধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তিনি মহাভাবে নিমগ্ন অবস্থায় এ জালে আবদ্ধ। জাল স্পর্শমাত্রে তাঁহারাও ধীবরের মত ভাবে নিমগ্ন হইয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

ঐদিন আমরা প্রায় দুই ঘন্টা সমুদ্রসৈকতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগাথা শুনিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীম তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে ঠাকুরের গীত একটি রামপ্রসাদের গান গাহিতে লাগিলেন। গতকালের মত আজও শ্রীম-র বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। দিব্য ভাবে তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মুখমণ্ডল বিকশিত, আর দুই নয়নকোণ হইতে গত কালের মতই অঝোরে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

পাঁচটার সময় আমরা দর্শনের জন্য মন্দিরে গমন করিলাম। দর্শনাদি সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়াই শ্রীম ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং আমরাও নৈশ আহারের পূর্ব পর্যন্ত ঐরূপ ধ্যানে অতিবাহিত করিলাম। তারপর বিশ্রাম।

৩

তৃতীয় দিন আমি একটি নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। যথারীতি সকালবেলায় আমরা মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ধ্যান করিতে হয়। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আর বাহির হইলেন না। আমরা ঘরেই বসিয়া পড়িলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীমকে যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা তিনি এ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন আমার নিকট তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা আমার নিকট অত্যন্ত অভিনব এবং আলোকপ্রদ বলিয়া মনে হইল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানপ্রণালী ঈশ্বরচিন্তার সহজ ও সরল পথ।

শ্রীম বলিলেন, ধ্যান করিবার সময় ধ্যেয়কে অর্থাৎ ইষ্টকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত ধ্যান করিতে হয়। ঠাকুর যখন ধ্যান করিতেন, নিমেষমধ্যেই তাঁহার ইষ্ট জগদম্বা ঠিক জীবন্ত মানুষের মত তাঁহার মনের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনিও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন যেমন আমি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সাক্ষাৎ ও জীবন্ত ধ্যান এবং ধ্যেয়ের সহিত বাক্যালাপ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ আমার বহুবার হইয়াছে। শ্রীম আরও বলিলেন, সচরাচর লোক যেরূপ ইষ্টের কেবলমাত্র প্রাণহীন ছবি কল্পনা করিয়া থাকে, ধ্যেয়ের সঙ্গে জীবন্ত ভাবের কোন সম্বন্ধ থাকে না, ঠাকুরের এই ধ্যানপ্রণালী সেরূপ শুষ্ক ও প্রাণহীন নয় — বরং সরস ও আনন্দপ্রদ। শ্রীম-র এই উপদেশে আমি ধ্যানসম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। এই নূতন প্রণালী আমি অদ্যাবধি অনুসরণ করিতেছি এবং তদ্দ্বারা প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইয়াছি।

চতুর্থ দিবসে মন্দির দর্শন ও পরিক্রমাদি করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে আমি শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত তিনি কিভাবে লিখিতেন। শ্রীম উত্তর করিলেন, আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়িতে এসে ডায়েরীতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় এক দিনের কথার নোট সাত দিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম। তাঁর এক-একটি কথার জন্য আমি

চাতকের মত চেয়ে থাকতাম। ডায়েরীর নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে ‘কথামৃত’ লিখিত হয়। এক-একটি scene আমি হাজার বারেরও বেশী ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম — সত্তর বৎসর পূর্বে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এই ভাবে বলা যেতে পারে যে জীবন্ত ঠাকুরের সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হত না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হত। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে ইহা অদ্য-অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হত।

অন্য ভক্তরা — যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি — কখনও কখনও ঠাকুরের কথামৃতের নোট রাখিতে চেষ্টা করিতেন সঙ্গোপনে। ঠাকুর জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ঐরূপ করিতে বারণ করিলেন। বলিলেন, ‘ইহা রাখিবার জন্য লোক আছে।’ স্বামী বিবেকানন্দের কথায়ও এই বিষয়টি, অর্থাৎ শ্রীম-ই যে কথামৃত লিখিবার জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিলেন তাহা বিশদ্রূপে পরিস্ফুট — 'I now understand why none of us attempted his life before. It was reserved for you – this great work'.

ভক্তদের সহিত কথা কহিবার সময় শ্রীম উপস্থিত না থাকিলে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন। কারণ, ঠাকুর জানিতেন এই মহাকার্যটি করিবার জন্য দৈবী মেধা ও স্মৃতিসম্পন্ন শ্রীম পূর্ব হইতেই জগদম্বা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট, শ্রীম তাঁহার জীবনীলেখকরূপে পূর্ব হইতেই চিহ্নিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে পূর্বে অনুষ্ঠিত কথামৃতের পুনরাবৃত্তি করিতে শ্রীমকে কখনও বলিতেন। শ্রীম-র বিবৃতিতে কথার রূপান্তর হইলে ঠাকুর তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীম বাড়িতে গিয়া তাঁহার পূর্বরক্ষিত ডায়েরীর নোট সংশোধন করিতেন।

শ্রীম আমাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় অবতারলীলার এইটুকু সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। তাই তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ ও চিরকালের জন্য বিক্রীত। শ্রীম আরও

বালিয়াছিলেন, ঠাকুরের অন্তর্ধানের পরও তাঁহার সরল সরস ও সুগভীর বাণী যাহাতে চিরকালের জন্য সুন্দর সহজ সরল ভাষায় বিদ্যমান থাকে এবং দেশবিদেশে প্রচারিত হয় — এই মহতী ইচ্ছাও হয়ত ঠাকুর পূর্ব হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। 'কথামৃত' তাই তাঁহারই কথার প্রতিচ্ছবি (photograph)। এই মহাকার্যে আমার মতন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা তাঁহারই অপরিসীম দৈবী মহিমা ও কৃপার পরিচয় প্রদান করে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান প্রধান অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীম-র অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রকাশনে তাঁহার অবদানকে কত উচ্চ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন — তাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার কলিকাতা অবস্থানকালে একদিন আমি মহাপুরুষ মহারাজকে বলিয়াছিলাম, আমি শ্রীমকে দর্শন করিতে যাইতেছি। ইনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, দর্শন করিবে বই কি? শ্রীম অসাধারণ পুরুষ! শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বেদব্যাস! আর একদিন স্বামী সারদানন্দজী মহারাজও শ্রীম-র পরিচয় অনুরূপভাবে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, শ্রীম বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাসদেব। আবার অন্য একদিন স্বামী অভেদানন্দজীর নিকট তাঁহার আশ্রমে তদীয় পবিত্র সঙ্গসুখলাভের জন্য গিয়াছিলাম। শ্রীম-র কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, শ্রীম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের' মাধ্যমে যেরূপ প্রচার করিয়াছেন তাহা আমাদের, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্তানগণের সম্মিলিত প্রচারের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, সকলের সম্মলিত প্রচারকার্য শ্রীম-র কথামৃতের মাধ্যমে প্রচারের সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। তারপর শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীগীতা হইতে উদ্ধৃত শান্তিপাঠস্বরূপ কথামৃতের মুখবন্দনায় লিখিত 'তব কথামৃতং' নামক শ্লোকটি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার পর আমাকে লইয়া তাঁহার আশ্রমস্থিত ঠাকুরমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বার বার বলিলেন যে, শ্রীমকে পুরীতে ও কলিকাতায় দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করায় তুমি সত্যই অতি সৌভাগ্যবান। আরও বলিলেন, পুরীতে শ্রীম-র সহিত বাস করায় তোমার সত্যকার সৎসঙ্গলাভ হইয়াছে এবং শ্রীম-র দৈবী

সাহচর্যে এক সপ্তাহকাল বাসে বাস্তবিকই তোমার তপস্যা কঠোর হইয়াছে। শ্রীম এই সপ্তাহকাল আমার হৃদয়মনকে কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ-সুধায় অবিরাম সিঞ্চিত করিয়াছেন। এই সপ্রেম সুধাবর্ষণ লাভ করিয়া আমি নিশ্চয়ই অতি ধন্য।

পূর্ব প্রসঙ্গ পুরীবাসের বর্ণনায় আবার ফিরিয়া যাইতেছি। চতুর্থদিনে আমরা যথারীতি অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় সমুদ্রসৈকতে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে শ্রীম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাই কীর্তন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ মহাজনদের রচিত তাঁহার প্রিয় কতকগুলি গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। তারপর তিনি আমাকে দক্ষিণ ভারতীয় শ্রীপুরন্দরদাস এবং অন্যান্য মহাজনদের সংগীত গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইল না, কারণ আমি সেসব গান জানি না। আমি দক্ষিণদেশীয় লোক আর সেই জন্যই আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। কয়েক ঘন্টা সমুদ্রসৈকতে আনন্দে অতিবাহিত করার পর শ্রীম আমাকে লইয়া পুনরায় সন্ধ্যা-আরতি দর্শনের জন্য মন্দিরে গিয়াছিলেন। আরতি দর্শনের পর আমরা বাসস্থানে ফিরিয়া আসি।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনেও আমরা পূর্বকথিত কার্যক্রমই অনুসরণ করিয়াছিলাম। তারপর আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাইবার জন্য বিদায় লইলাম। শ্রীম অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে আমায় বলিলেন, আমি যখন কলিকাতায় ফিরিব সেখানেও আপনি দেখা করিলে সুখী হইব। আমিও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার কলিকাতা বাসকালে নিয়ম করিয়া সপ্তাহে দুইবার শ্রীম-র বাসস্থানে ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন ইনস্টিটিউশানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতাম। আমার সঙ্গে যাইতেন অদ্বৈত আশ্রমের মহাবীর মহারাজ (স্বামী প্রেমাত্মানন্দ)। প্রতিবারে আমি শ্রীম-র নিকট স্বামী রাঘবানন্দজীকে দর্শন করিতাম। তাহা ছাড়াও ২৫।৩০ জন ভক্তকে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম। তাঁহারা সকলে জগৎ ভুলিয়া সমাহিত চিত্তে হৃদয়-মন উন্নতকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী শ্রীম-র কণ্ঠে শ্রবণ করিতেন।

একদিন শ্রীম কৃপা করিয়া আমাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন আর

ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র স্থানসমূহ দর্শন করাইলেন। যে সকল বিশিষ্ট স্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যেস্থানে তাঁহার উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যগণ ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেন, যেখানে স্বামীজী মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে গান শুনাইতেন, শিবমন্দিরের সিঁড়িতে যেখানে ঠাকুর প্রায়ই বসিতেন এবং যেখানে তাঁহার ফটো লওয়া হইয়াছিল, শ্রীম ও ভক্তগণ যেখানে ঠাকুরের আদেশে ধ্যান করিতেন — সেই সকল পবিত্র স্থান আমাকে দর্শন করাইলেন। ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় যেখানে স্বামীজীর কণ্ঠে 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন'— এই গানটি শুনিয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়াইয়া ঠাকুর সমাধিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, শ্রীম যে স্থানে প্রথমে তাঁহাকে সমাধিস্থ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এই সকল মহা পুণ্যস্থানও একে একে তাঁহার কৃপায় দর্শন হইল।

ইহার পর শ্রীম আমাকে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার স্থান পঞ্চমুণ্ডীর আসন বিল্ববৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন। বলিলেন, একদিন ঠাকুর আমাকে গভীর অরণ্যে এই বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিন ঘন্টা অতীত হইয়া গেল, আমি তাঁহার ঘরে ফিরিতেছি না দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং আমার সংবাদ লইতে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। বিল্ববেদিকার উপর দক্ষিণ দিকে পূর্বমুখী হইয়া আমি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম। ঠাকুর বেদীর নিম্নে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সান্নিধ্যপ্রভাবে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিলাম, চোখ মেলিয়া তাঁহাকেই সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে হতবাক্ হইয়া তাঁহার পাদমূলে বিলুণ্ঠিত হইলাম। শ্রীম আজও আমার সম্মুখে সেই মহাপবিত্র চরণতীর্থে ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম নিবেদন করিলেন।

শ্রীম-র আচার-আচরণে বুঝিলাম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানে সিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীম ঠাকুরকে যেরূপ বাহিরে পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইয়াও পৌরাণিক বীরশিশু তপস্বী ধ্রুব-র মতই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীম তাই শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানে সিদ্ধ মহাপুরুষ।

মঠে ফিরিয়া শ্রীমসঙ্গে বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ঠাকুরের পবিত্র লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরধাম দর্শনের এই সকল কথা বলিলাম। সব কথা শুনিয়া

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, শ্রীম সত্যই তোমাকে ঠাকুরের প্রকট মূর্তি ছাড়া দিব্য দক্ষিণেশ্বর ধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। তুমি ধন্য!

আমি ভাবিলাম, প্রকট মূর্তি দর্শনের আবশ্যকতাই বা কি? এই দিব্য লীলাভূমিতে তাঁহার দিব্যচেতন স্পর্শ আমার হৃদয়মনকে দিব্যানন্দে আপ্লুত করিয়াছে। বুঝিলাম, ঠাকুর আজও চৈতন্যরূপে সেখানে বিরাজিত। তাই বৃক্ষলতা, বাড়িঘর—সকল স্থান তাঁহার দিব্য চেতনা বহন করিতেছে।

এই পবিত্র বর্ণনা সমাপ্ত করিবার পূর্বে অমরগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতার রচয়িতা ভগবান বেদব্যাসকে যেরূপ স্তুতি করা হয় তদ্রূপ কথামৃত-রচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ব্যাস শ্রীমকেও অনুরূপ একটি স্তব-কুসুমাঞ্জলিতে অর্চনা করিতেছি।

হে মহামানব শ্রীম, নমি শত বার তব পায়,
ভগবানের প্রিয় তুমি, তাঁহার চিহ্নিত বার্তাবাহক।
তাঁহার প্রেম আর মহাবাণী জগতে প্রতি ঘরে ঘরে
করেছ প্রচার, তব অমরগ্রন্থ ‘কথামৃত’ মাধ্যমে।
সত্য সত্য তোমায় বন্দি হে মহানায়ক,
দ্বিতীয় ব্যাসরূপে তুমি করিয়াছ দান রামকৃষ্ণগীতা
তব পদে বারংবার আমার প্রণাম।

—